**ডেঙ্গু প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে**

ডেঙ্গু পরিস্থিতির অবনতি ঠেকানো যাচ্ছে না। ১৪ আগস্ট স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের দেওয়া ডেঙ্গু পরিস্থিতির তথ্য অনুযায়ী, ১৩ আগস্ট সকাল ৮টা থেকে ১৪ আগস্ট সকাল ৮টা পর্যন্ত সারা দেশে ২ হাজার ৪৮০ জন নতুন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে ঢাকা শহরের সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৯১৯ জন এবং ঢাকা শহরের বাইরে সারা দেশে ১ হাজার ৫৬১ জন ভর্তি হয়েছেন। একই সময়ে সারা দেশে ডেঙ্গুতে মারা গেছেন ১৮ জন। এর মধ্যে ঢাকা শহরে মারা গেছেন ১১ জন এবং বিভিন্ন জেলায় মারা গেছেন ৭ জন। এ পর্যন্ত যে ৪১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, এর মধ্যে ৭৬ শতাংশ ঢাকা শহরে এবং বাকি ২৪ শতাংশ দেশের বিভিন্ন জেলায়। মৃতদের মধ্যে ৮০ শিশু, যাদের বয়স ১৮ বছরের নিচে। (সূত্র : প্রথম আলো, ১৫ আগস্ট ২০২৩)।

ডেঙ্গু পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। হাতের কাছে যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তা থেকে অনুমান করা যায় রাজধানী ঢাকায় ডেঙ্গু পরিস্থিতি সারা দেশের তুলনায় অধিকতর বিপজ্জনক। ঢাকায় জনঘনত্ব বাংলাদেশের অন্য সব শহরের তুলনায় অনেক বেশি এবং গ্রামের তুলনায় বেশি তো বটেই। এদেশে গত বেশ কবছর ধরে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা গেছে। তবে এবারের ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব অন্য বছরগুলোর তুলনায় অনেক বেশি উদ্বেগজনক। রোগের লক্ষণেও এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। এখন এ রোগের লক্ষণকে বিশেষ একটা প্যাটার্নে ফেলা যায় না। ফলে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় দেখা দিচ্ছে সমস্যা। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ব্যক্তির একাধিক কারণে মৃত্যু হতে পারে। তা জানা যায় মৃত্যুর ঘটনাগুলোর পর্যালোচনা থেকে। ২০১৯ সালে রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইবিসিআর) এই পর্যালোচনা করেছিল।

গত বছরেরও মৃত্যুর পর্যালোচনা হয়েছিল। এ বছরেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ডেঙ্গুর মৃত্যুর পর্যালোচনা করছে বলে জানা গেছে। জনস্বাস্থ্যবিদদের কাছ থেকে জানা যায়, মৃত্যুর পর্যালোচনার ফলে বেশকিছু বিষয় পরিষ্কারভাবে জানা গেছে। যেমন-ডেঙ্গু শনাক্ত হওয়ার কতদিন পর রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন, রোগীর কী জটিলতা ছিল, তাকে কী চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল, কোন বয়সিরা বেশি মারা যাচ্ছে, বয়স্কদের ডেঙ্গু ছাড়া অন্য কী রোগ ছিল, ডেঙ্গুর কোন ধরনে (ভ্যারিয়েন্ট) বেশি মৃত্যু হয়েছে, ডেঙ্গু ঢাকা শহরে মহামারি আকারে দেখা দিয়েছে ইত্যাদি। এই রোগে মৃত্যুও ঘটছে। এ রোগটি ছড়ায় ডেঙ্গুর ভাইরাসবাহী এডিস মশার দংশনের ফলে। রাজধানী ঢাকায় পরিছন্নতা পরিস্থিতি সন্তোষজনক না হওয়ায় ডেঙ্গুর সংক্রমণ ঠেকানো যাচ্ছে না। একজন নামকরা জনস্বাস্থ্যবিদ মন্তব্য করেছেন, ‘আমরা বৈজ্ঞানিক পন্থায় এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি, মৃত্যুর কারণ জানতেও বৈজ্ঞানিক পন্থা বেছে নেইনি। মৃত্যুর কারণ জানতে পারলে ডেঙ্গু চিকিৎসার নির্দেশিকা পরিবর্তন করা যেত, কোথাও কোনো সমস্যা চিহ্নিত হলে তা দূর করার পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হতো, মৃত্যু এড়ানো যেত।’ সরকারের তথ্য বলছে, ঢাকা শহরে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এ হাসপাতালে গত ১৪ আগস্ট পর্যন্ত ৭৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকার বাইরে বেশি মৃত্যু হয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগে। এ বিভাগে এ পর্যন্ত ২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, তার মধ্যে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন ২৩ জন।

অনেক ক্ষেত্রেই ডেঙ্গুজ্বরের কোনো উপসর্গ থাকে না। কারও কারও ক্ষেত্রে সাধারণ ফ্লুতে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণগুলো প্রকাশিত হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ডেঙ্গুজ্বরের শুরু থেকে জ্বর, মাথাব্যথা, গা-হাত-পা ব্যথা, অস্থি সন্ধিতে ব্যথা, চোখের পেছন দিকে ব্যথা, পিঠে ব্যথা, বমি, পেটে ব্যথা, অরুচি, পাতলা পায়খানা হতে পারে। চতুর্থ-পঞ্চম দিনে জ্বর চলে যায়। ক্ষেত্রবিশেষে আবার ফেরত আসে জ্বর। জ্বর কমতে থাকলে প্লাটিলেট কমতে শুরু করে। অনেকের এ কণিকা বিপৎসীমার অনেক নিচে নেমে যায়। শুরু হতে পারে রক্তক্ষরণ, বিপর্যয়। ডেঙ্গুতে অনেক সময় মারাত্মক কিছু জটিলতা তৈরি হতে পারে। এসব জটিলতায় সাধারণত লিভার, কিডনি, মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদি অঙ্গ আক্রান্ত হতে পারে। এসব অঙ্গ যখন আক্রান্ত হয়, তখন অস্বাভাবিক কিছু লক্ষণ ফুটে ওঠে। এ জটিলতাগুলোকে বলা যায় এক্সপান্ডেড ডেঙ্গু সিন্ড্রোম। মস্তিষ্ক আক্রান্ত হলে হতে পারে এনকেফালাইটিস। এর ফলে তীব্র মাথাব্যথা, বমি, খিঁচুনি, কথাবার্তায় অসংলগ্নতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে। রোগী কখনো মূর্ছা যেতে পারে। কখনো মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হতে পারে কিংবা রক্তনালি আটকে যেতে পারে। ডেঙ্গু থেকে হতে পারে হেপাটাইটিস বা যকৃতের প্রদাহ। এ থেকে হঠাৎ করে যকৃৎ বিকল হয়ে যেতে পারে। ডেঙ্গু জ্বরে পিত্ত থলিতে পাথর না থাকলেও প্রদাহ সৃষ্টি হয়। এটি অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে ডেঙ্গু থেকে হতে পারে ডায়রিয়া। প্লিহা ফেটে যেতে পারে। ডেঙ্গুর কারণে হৃৎপিণ্ডের পেশিকোষ আক্রান্ত হতে পারে। এটাকে বলা হয় মায়োকার্ডাইটিস। ডেঙ্গু থেকে হৃদস্পন্দন এলোমেলো হতে পারে। হৃৎপিণ্ডের বাইরের প্রাচীরে প্রদাহ হতে পারে, পানি জমে যেতে পারে। ডেঙ্গু ভাইরাস ক্ষেত্র বিশেষে ফুসফুস বিকল করে দিতে পারে। ডেঙ্গু থেকে কিডনি বিকল হতে পারে। ডেঙ্গুর এক্সপান্ডেড সিন্ড্রোম সম্পর্কে এসব তথ্য দিয়েছেন লে. কর্নেল ডাক্তার নাসির উদ্দিন আহমেদ।

ডেঙ্গু কী ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনে তা জানা গেল উপর্যুক্ত তথ্য থেকে। উদ্বেগের বিষয় হলো, ডেঙ্গুর জটিলতায় প্রয়োজনীয় মেডিকেল যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ বাংলাদেশের অধিকাংশ হাসপাতালে নেই। শুধু তাই নয়, এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে চিকিৎসা দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত জনবলের ঘাটতিও আছে। দেখা যাচ্ছে ডেঙ্গুর চিকিৎসা বিভিন্ন পর্যায়ে হতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে এর চিকিৎসা তেমন কঠিন না হলেও জটিলতার পর্যায়ে চলে গেলে রোগী বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে কাঙ্ক্ষিত মানের চিকিৎসা দেওয়ার মতো সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন হাসপাতালের ঘাটতি রয়েছে। অন্যদিকে চলছে হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বাণিজ্য। মানহীন হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে চিকিৎসা নিতে গিয়ে রোগীরা হন প্রতারিত। যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করার পরেও ভালো চিকিৎসা পাওয়া যায় না। ডেঙ্গুর মতো সংক্রমণ যখন ব্যাপক হয়ে ওঠে, তখন এটি প্রতিরোধে মানসম্মত এবং পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা পাওয়া যায় না। সংক্রামক ব্যাধির ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে আমাদের নজর দিতে হবে সংক্রমণ রোধের ওপর। দুর্ভাগ্যবশত, এ কাজে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। দুর্নীতির ফলে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাদি কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না। নগরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং রোগ বিস্তারকারী মশা-মাছি ও কীটপতঙ্গ উচ্ছেদের জন্য যে প্রতিষেধক কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়, সেগুলো দিয়ে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না বলে অভিযোগ আছে। এক্ষেত্রে দুর্নীতির গন্ধ পাওয়া যায় বলে অনেকেই মনে করেন। আমাদের সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন বোর্ডগুলোকে যথার্থ পরিষেবা প্রদানে বাধ্য করা যাচ্ছে না। এই স্থানীয় সরকারগুলো সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে যথাযথ কার্যক্রম হাতে নিচ্ছে না বলে অভিযোগ আছে। এসব সংস্থাকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পরিষেবা প্রদানে প্রণোদিত করতে হবে এবং যে কোনো ব্যর্থতার জন্য এসব সংস্থাকে জবাবদিহির আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

রোগব্যাধি ও নাগরিক স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে বাংলাদেশে গবেষণা খুব কমই হয়। কীভাবে স্বাস্থ্য গবেষকদের গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা যায়, তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশে এ মুহূর্তে মানসম্পন্ন ডজন সংখ্যক ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব ওষুধ কোম্পানি প্রচুর মুনাফা করে। এ কোম্পানিগুলো নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কারে গবেষণার জন্য তাদের মুনাফার একটি অংশ ব্যয় করতে পারে। যেসব ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এ ধরনের গবেষণায় অর্থ ব্যয় করবে, তাদের আয়কর পরিশোধে রেয়াত দেওয়া যায়। এ ধরনের প্রণোদনা পরিস্থিতিতে দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। যতই সময় গড়াচ্ছে ডেঙ্গুর মতো রোগ জটিল ও ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। আমাদের উচিত হবে একদিকে এ রোগের সংক্রমণ রোধ করতে যথাযথ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা এবং অন্যদিকে রোগাক্রান্তদের সুস্থ করার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা উৎসাহিত করা।